এপ্রিল-জুন ২০১২

ISSN 2222-5188

IM
Info Medicus

ইনফো মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

১ম পর্ব, ১ম সংখ্যা ২০১২

- পেপটিক আলসার
- উচ্চ রক্তচাপ
- অ্যাজমা

১ম সংখ্যা, ২০১২

সূচী

পেপটিক আলসার	৩
উচ্চ রক্তচাপ	৪
অ্যাজমা	৬
শিশুকে কৃমি মুক্ত রাখা	৬
ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী রোগ (সিওপিডি)	৭
কলেস্টেরল-কিছু তথ্য	৮
ইনফো কুইজ	৯

সম্পাদক মন্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডা: সাইদুর রহমান
ডা: খান রেজওয়ান হাবীব
ডা: তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডা: অনন্যা মন্ডল

প্রকাশনায়

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস্
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ডিটিপি
এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস্

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ

ইনফো মেডিকাস এর ২০১২ সালের প্রথম সংখ্যাটি আপনাদের হাতে পৌছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই সংখ্যায় বহুল আলোচিত পেপটিক আলসার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, অ্যাজমা, কলেস্টেরল প্রভৃতি বিষয়ে এবং সেই সাথে এ সকল রোগে আমাদের কয়েকটি ওষুধের ব্যবহারের উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

সবশেষে এসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য রইল শুভকামনা।

শুভেচ্ছান্তে
ডা: সাইদুর রহমান

পেপটিক আলসার

পেপটিক আলসার

পেপটিক আলসার হলো পেটের পাকস্থলী (Stomach) অথবা ক্ষুদ্রান্ত্রের (Upper small intestine বা Duodenum) ভেতরের দেয়ালে ক্ষত। এই ক্ষতগুলি সৃষ্টির মূলে থাকে পাকস্থলী-নিঃসৃত জীর্ণকারক বা হজমী রস- যাতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপ্সিন নামক একরকমের এনজাইম থাকে। পাকস্থলীর অভ্যন্তরের দেয়ালে যদি ক্ষত হয়, তাহলে সেই পেপটিক আলসারকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক আলসার, ক্ষুদ্রান্তের আভ্যন্তরীণ দেয়ালে ক্ষত হলে, সেটাকে বলা হয় ডিওডেনাল আলসার। পেপটিক আলসার যে শুধু মাত্র পাকস্থলীতেই হয়ে থাকে তা কিন্তু নয় বরং এটি পৌষ্ঠিক তন্ত্রের যেকোনো অংশেই হতে পারে। সাধারণত পৌষ্ঠিক তন্ত্রের যে যে অংশে পেপটিক আলসার দেখা যায় সে গুলো হচ্ছে-

- অন্ননালীর নিচের প্রান্ত
- পাকস্থলী
- ডিওডেনামের বা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ
- পৌষ্ঠিক তন্ত্রের অপারেশনের পর যে অংশ জোড়া লাগানো হয় সে অংশে

পেপটিক আলসার কেন হয় ?

প্রধান কারণ:

এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ। হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি (*Helicobacter pylori*) বলে এই ধরণের ব্যাক্টেরিয়া পাকস্থলীর ভেতরের শ্লৈষ্মিক আস্তরণকে (mucous lining) সংক্রমিত করে-যা পরে জীর্ণকারক রসের প্রভাবে আলসারে পরিণত হয়।

এই অসুখের আরেকটি প্রধান কারণ হল:

নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি (NSAID) ওষুধের ব্যবহার। যদিও ঠিক কেন এর ফলে আলসার হয়- সেটা এখনও খানিকটা অস্পষ্ট একটা সম্ভাবনা হল, এই ওষুধ গুলি পাকস্থলীর ভেতরের আস্তরণকে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন (Prostaglandine) নামে যে রাসায়নিক পদার্থ রক্ষা করে তার কাজ ব্যহত করে। আবার এও সম্ভব যে, NSAID সোজাসুজি পাকস্থলীর ভেতরের আস্তরণকে উত্তেজিত করে আলসারের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বংশগত :

কারো নিকটতম আত্মীয় স্বজন যেমন- মা, বাবা, চাচা, খালা, ফুফু যদি এ রোগে ভুগে থাকেন তবে তাদের পেপটিক আলসার হবার ঝুঁকি বেশি থাকে। যাদের রক্তের গ্রুপ 'ও' তাদের মধ্যে এ রোগের প্রবণতা বেশি।

ধূমপান :

ধূমপায়ীদের মধ্যে এ রোগের প্রবণতা বেশি।

এছাড়াও কারো পৌষ্ঠিকতন্ত্র থেকে যদি বেশি পরিমাণে এসিড এবং প্রোটিন পরিপাককারী এক ধরনের এনজাইম যা পেপসিন নামে পরিচিত তা নিঃসৃত হতে থাকে এবং জন্মগতভাবেই পৌষ্ঠিকতন্ত্রের গঠনগত কাঠামো দুর্বল থাকে তাহলে ও পেপটিক আলসার হতে পারে। তবে সাধারণত যে কথাটা প্রচলিত ভাজা-পোড়া কিংবা ঝাল জাতীয় খাবার খেলে পেপটিক আলসার হয় এর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে মেলেনি। তবে যারা নিয়মিত আহার গ্রহণ করেন না কিংবা দীর্ঘ সময় উপোস থাকেন তাদের পেপটিক আলসার দেখা দিতে পারে।

পেপটিক আলসারের লক্ষণগুলি কি ?

নানা ভাবে এই অসুখের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই বাহ্যিক লক্ষণ দেখে এই অসুখটি হয়েছে কিনা বোঝা একটু মুশকিল।

সাধারণভাবে :

- নাভির একটু উপরে ও পাঁজরার নিচে জ্বালা ভাব, কামড়ানি, অনেক সময় ব্যথাটা পিঠ পর্যন্ত চলে যায়
- পেটের ব্যথা কয়েক মিনিটের জন্য হতে পারে আবার কয়েক ঘণ্টাও থাকতে পারে
- সাধারণত ব্যথাটা এন্টাসিড, অর্থাৎ অ্যাসিড কমানোর ওষুধ খেলে চলে যায় মাঝে মাঝে বেশ কয়েকদিন ব্যথা হবার পর হঠাৎ কিছুদিন ব্যথা- মুক্তি
- খিদে কমে যাওয়া, ওজনও কমা
- খাওয়ার পর বমি-বমি ভাব বা বমি করা
- বমির সঙ্গে ছোট ছোট কালো কালো রক্তের টুকরো (কফির গুড়োর মতো দেখতে) পড়া
- কালো পায়খানা হওয়া কিংবা পায়খানার কাল্‌চে লাল রক্ত থাকা

এই লক্ষণগুলি গ্যাষ্ট্রিক বা ডিওডেনাল- দুই রকম আলসারের ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে। মুশকিল হল, এইসব বাহ্যিক লক্ষণ শতকরা পঞ্চাশভাগ ক্ষেত্রে অসুখ ঘোরতর অবস্থায় না পৌঁছলে প্রকাশ পায় না। ঘোরতর বলতে ক্ষত থেকে রক্তপাত, পাকস্থলী ফুটো হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি।

কি করে বোঝা যায় পেপটিক আলসার হয়েছে ?

অসুখটি সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে হলে বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে। এন্ডোস্কোপি, বা প্রয়োজন হলে USG করে এই রোগ সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায়।

এই রোগের চিকিৎসা কি ?

সাধারণভাবে এর চিকিৎসা হল ওষুধ দিয়ে পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত অ্যাসিডের পরিমাণ কমানো। যদি *H.pylori*-র সংক্রমণ থাকে, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সেটিকে সারানো। এ ছাড়া জীবনযাত্রার পরিবর্তন, যেমন: ধূমপান বন্ধ করা, চা-কফি কমিয়ে দেওয়া, মদ্যপান কমানো, দুশ্চিন্তা কমানো- এগুলি সবই ক্ষত কমানোর সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

শৃংখলা :

পেপটিক আলসারে আক্রান্ত রোগীদের অবশ্যই ধূমপান বন্ধ করতে হবে। ব্যথানাশক ঔষধ অর্থাৎ এসপ্রিন জাতীয় ঔষধ সেবন থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে এবং নিয়মিত খাবার গ্রহণ করতে হবে।

ঔষধ :

পেপটিক আলসারের রোগীরা সাধারণত এন্টাসিড, রেনিটিডিন, ফেমোটিডিন, ওমিপ্রাজল, লেনসোপ্রাজল, পেনটোপ্রাজল জাতীয় ঔষধ সেবনে উপকৃত হন।

কারণভিত্তিক চিকিৎসা :

জীবাণু জনিত কারণে যদি এ রোগ হয়ে থাকে তবে বিভিন্ন ঔষধের সমন্বয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয় যা ট্রিপল ড্রাগ থেরাপী নামে পরিচিত।

অপারেশন :

পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে অপারেশন সাধারণত জরুরি নয়। তবে দীর্ঘ মেয়াদী ঔষধ সেবনের পরও যদি রোগী ভাল না হন, সেক্ষেত্রে অপারেশন করিয়ে রোগী উপকৃত হতে পারেন।

সময় মত পেপটিক আলসারের চিকিৎসা না করলে রোগীর নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে। যেমন-

- পাকস্থলী ফুটো হয়ে যেতে পারে
- রক্ত বমি ও কালো পায়খানা হতে পারে
- রক্তশূণ্যতা হতে পারে
- ক্যান্সার হতে পারে (কদাচিৎ) এবং
- পৌষ্ঠিক নালীর পথ সরু হয়ে যেতে পারে

ঔষধ সেবন ঃ

ট্রিপল ড্রাগ থেরাপী

- ট্যাবলেট **এমোটেক্স** (মেট্রোনিডাজল) ৪০০ মি: গ্রাম ১২ ঘণ্টা পর পর ৭ দিন অথবা ক্যাপসুল **এভলোমক্স** (এমোক্সিসিলিন) ১ গ্রাম ১২ ঘণ্টা পর পর ৭ দিন।
- ক্যাপসুল **জেলড্রিন** (ওমিপ্রাজল), ২০ মি: গ্রাম ১২ ঘণ্টা পর পর ৭ দিন।
- ট্যাবলেট ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মি: গ্রাম ১২ ঘণ্টা পর পর ৭ দিন।
- **৭ দিন পর থেকে,** ক্যাপসুল **জেলড্রিন** (ওমিপ্রাজল), ২০ মি: গ্রাম দিনে ২ বার করে চলবে যতদিন উপসর্গ নিরাময় না হয়।

উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ প্রায়ই একটি স্থায়ী রোগ হিসেবে বিবেচিত। এর জন্য চিকিৎসা ও প্রতিরোধ দুটোই জরুরী। তা না হলে বিভিন্ন জটিলতা, এমনকি হঠাৎ মৃত্যুরও ঝুঁকি থাকে।

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন কী ?

স্বাভাবিক রক্তচাপ হলো সেই বল, যার সাহায্যে রক্ত শরীরের এক স্থান অন্য স্থানে পৌছায়। রক্তচাপের কোনো একক নির্দিষ্ট মাত্রা নেই। বিভিন্ন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একেকজন মানুষের শরীরে রক্তচাপের মাত্রা ভিন্ন এবং একই মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে স্বাভাবিক এই রক্তচাপও বিভিন্ন রকম হতে পারে। উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, অধিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামের ফলে রক্তচাপ বাড়তে পারে। ঘুমের সময় এবং বিশ্রাম নিলে রক্তচাপ কমে যায়। রক্তচাপের এই পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়ে। অধিকাংশ সময় রক্তচাপের মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রার ভেতরই থাকে। সাধারণত বয়স যত কম, রক্তচাপও তত কম নয়। যদি কারও রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি হয় এবং অধিকাংশ সময় এমনকি বিশ্রামকালীনও বেশি থাকে, তবে ধরে নিতে হবে, তিনি উচ্চ রক্তচাপের রোগী।

উচ্চ রক্তচাপ কি আসলেই কোনো জটিল ব্যাধি ?

উচ্চ রক্তচাপ ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনতে পারে। অনেক সময় উচ্চ রক্তচাপের কোনো প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যায় না। নীরবে উচ্চ রক্তচাপ শরীরের বিভিন্ন অংশকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। এ জন্যই উচ্চ রক্তচাপকে 'নীরব ঘাতক' বলা যেতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত এবং চিকিৎসাবিহীন উচ্চ রক্তচাপ থেকে মারাত্মক শারিরীক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ হলে কী কী জটিলতা হতে পারে ?

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত না থাকলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ চারটি অঙ্গে মারাত্মক ধরনের জটিলতা হতে পারে। যেমন- হৃৎপিন্ড, কিডনি, মস্তিস্ক ও চোখ। অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ থেকে হৃদযন্ত্রের মাংসপেশি দূর্বল হয়ে যেতে পারে। দূর্বল হৃদযন্ত্র রক্ত পাম্প করতে পারে না এবং এ অবস্থাকে বলা হয় হার্ট ফেইলিওর। রক্তনালীর গাত্র সংকুচিত হয়ে হার্ট অ্যাটাক বা ইনফার্কশন হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মস্তিস্কে স্ট্রোক হতে পারে, যা থেকে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। এ ছাড়া চোখের রেটিনাতে রক্তক্ষরণ হয়ে অন্ধত্ব বরণ করতে হতে পারে।

কী কী কারণে উচ্চ রক্তচাপ হয় ?

৯০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কোনো নির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না, একে প্রাইমারি বা এসেন্সিয়াল রক্তচাপ বলে। কিছু কিছু বিষয় উচ্চ রক্তচাপের আশঙ্কা বাড়ায়, যা নিম্নরূপ-

বংশানুক্রমিক :

উচ্চ রক্তচাপের বংশগত ধারাবাহিকতা আছে, যদি বাবা-মায়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তবে সন্তানেরও হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ধূমপান :

ধূমপায়ীদের শরীরে তামাকের নানা রকম বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় উচ্চ রক্তচাপসহ ধমনী, শিরার নানা রকম রোগ ও হৃদরোগ দেখা দিতে পারে।

অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ :

খাওয়ার লবনে সোডিয়াম থাকে, যা রক্তের জলীয় অংশ বাড়িয়ে দেয়। ফলে রক্তের আয়তন বেড়ে যায় এবং রক্তচাপও বেড়ে যায়।

অধীক ওজন এবং অলস জীবনযাত্রা :

যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম না করলে শরীরের ওজন বেড়ে যেতে পারে। এতে হৃদযন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং এর ফলে অধিক ওজন সম্পন্ন লোকদের উচ্চ রক্তচাপ হয়ে থাকে।

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যভ্যাস :

অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার, যেমন- মাংস, মাখন ও ডুবোতেলে ভাজা খাবার খেলে ওজন বাড়বে। ডিমের হলুদ অংশ এবং কলিজা, গুর্দা, মগজ- এসব খেলে রক্তে কলেস্টেরল বেড়ে যায়। রক্তে অতিরিক্ত কলেস্টেরল হলে রক্তনালির দেয়াল মোটা ও শক্ত হয়ে যায়। এর ফলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে।

অতিরিক্ত মদ্যপান :

যারা নিয়মিত অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করে, তাদের উচ্চ রক্তচাপ বেশি হয়।

ডায়াবেটিস :

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিস রোগীদের উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়।

অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা :

অতিরিক্ত রাগ, উত্তেজনা, ভীতি এবং মানসিক চাপের কারণেও রক্তচাপ সাময়িকভাবে বেড়ে যেতে পারে। কিছু কিছু রোগের কারণে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। নির্দিষ্ট কারণ খুজে পাওয়া না গেলে একে বলা হয় সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন। এ কারণগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো- কিডনির রোগ, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ও পিটুইটারি গ্রন্থির টিউমার, ধমনির বংশগত রোগ, গর্ভধারণ অবস্থায় অ্যাকলাম্পসিয়া ও প্রি-অ্যাকলাম্পসিয়া হলে, অনেক দিন ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ির ব্যবহার, স্টেরয়েড-জাতীয় হরমোন গ্রহণ এবং ব্যথানাশক কিছু কিছু ওষুধ খেলে।

উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমাতে কী করা উচিত ?

জীবনযাত্রার পরিবর্তন এনে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে :

খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। একবার লক্ষ্য অনুযায়ী ওজনে পৌঁছালে সীমিত আহার করা উচিত এবং ব্যায়াম অব্যাহত রাখতে হবে। ওষুধ খেয়ে ওজন কমানো বিপজ্জনক। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওজন কমানোর ওষুধ না খাওয়াই ভালো।

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা :

কম চর্বি ও কম কলেস্টেরলযুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। যেমন- খাসি বা গরুর মাংস, কলিজা, মগজ, গিলা, গুর্দা, ডিম কম খেতে হবে। বেশি আশযুক্ত খাবার গ্রহণ করা ভালো।

লবন নিয়ন্ত্রণ :

তরকারিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ পরিহার করতে হবে।

মদ্যপান পরিহার :

মদ্যপান পরিহার করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যা হাটাচলা, সম্ভব হলে দৌড়ানো, হালকা ব্যায়াম, লিফটে না চড়ে সিড়ি ব্যবহার করতে হবে।

ধূমপান বর্জন :

ধূমপান অবশ্যই বর্জনীয়। ধূমপায়ীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকুন। তামাক পাতা, জর্দা, গুল লাগানো ইত্যাদিও পরিহার করতে হবে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ :

যাদের ডায়াবেটিস আছে, তা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মানসিক ও শারিরীক চাপ সামলাতে হবে:

নিয়মিত বিশ্রাম, সময়মতো ঘুমানো, শরীরকে অতিরিক্ত ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম দিতে হবে।

রক্তচাপের নিয়মিত পরীক্ষা কি কি ?

নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করানো উচিত। যত আগে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ে, তত আগে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং জটিল রোগ বা প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

উচ্চ রক্তচাপ হলে কি চিকিৎসা করাতেই হবে ?

উচ্চ রক্তচাপ সারে না, একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এর জন্য নিয়মিত ওষুধপত্র সেবন করতে হবে। কোনক্রমেই চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া ওষুধ সেবন বন্ধ করা যাবে না। অনেকেই আবার উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত জানার পরও ওষুধ খেতে অনীহা প্রকাশ করেন। এ ধরনের রোগীরাই হঠাৎ হৃদরোগ বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হন, এমনকি মৃত্যুও হয়ে থাকে।

ঔষধ সেবন ঃ

- ট্যাবলেট **বিপিনর** (নিভিভোলল) ২.৫ মি: গ্রাম দিনে ২বার অথবা ৫ মি: গ্রাম দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **টেনোরেন** (এটিনোলোল) ৫০ মি: গ্রাম দিনে ২ বার অথবা ১০০ মি: গ্রাম দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **ইনডিভার** (প্রোপানোলল) ৪০ মি: গ্রাম দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **ডিলাপ** (ফ্রুসিমাইড + স্পাইরোনো লেকটন) ২০/৫০ মি: গ্রাম দিনে ১ বার অথবা ৪০/৫০ মি: গ্রাম দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **এবেটিস** (অলমেসারটান) ২০ মি: গ্রাম দিনে ২ বার অথবা ৪০ মি: গ্রাম দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **এবেটিস প্লাস** (অলমেসারটান + হাইড্রো ক্লোরো থায়াজাইড) ২০/১২.৫ মি: গ্রাম দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **টেনোক্যাপ** (এটিনোলোল + এমলোডিপিন) ২৫/৫ মি: গ্রাম দিনে ১ বার অথবা ৫০/৫ মি: গ্রাম দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **ক্যাব** (এমলোডিপিন) ৫ মি: গ্রাম দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **এবেক্যাপ** (এমলেডিপিন + অলমেসারটান) ২০/৫ মি: গ্রাম দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **রোসাটান** (লোসারটান) ২৫ মি: গ্রাম দিনে ২ বার অথবা ৫০ মি: গ্রাম দিনে ১ বার।

অ্যাজমা

অ্যাজমা হচ্ছে ফুসফুসের ভিতর শ্বাসনালীর একধরনের রোগ। অ্যাজমা যে কোন বয়সে হতে পারে। অ্যাজমা হলে ফুসফুসের শ্বাসনালীগুলোর দেয়াল মোটা হয়ে যায় এবং ফুলে যায়। যার কারণে সহজেই অ্যাজমা অ্যাটাক হয়। অ্যাজমা অ্যাটাকের সময় কম পরিমান বাতাস ফুসফুসের ভিতরে যায় এবং ফুসফুস থেকে বাইরে আসে। রোগী কাশি দিতে শুরু করে এবং বুকের ভিতর বাশির মত সাঁ সাঁ শব্দ হতে থাকে। বুকে আটসাট বা দমবন্ধ অনুভব হতে থাকে। অনেক জিনিসই অ্যাজমা অ্যাটাককে ত্বরান্বিত করতে পারে। এদেরকে অ্যাজমা উত্তেজক বলা হয়।

অ্যাজমার কারন সমূহ কি?

- জীবজন্তুর পশম
- পাখির পালক
- সিগারেটের ধোঁয়া
- ঝাড় দেয়া থেকে উদ্ভুত ধুলা
- ছত্রাক
- তীব্র গন্ধ এবং স্প্রে
- ফুলের পরাগরেনু
- ঠান্ডা
- স্যাঁত স্যাঁতে আবহাওয়া
- দৌড়, খেলাধুলা
- অতিরিক্ত পরিশ্রম
- কিছু কিছু খাবার

অ্যাজমার উপসর্গ সমূহ কি কি?

- কথা বলতে কষ্ট হয়
- শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টকর হয়
- ঠোঁট ও নখ ছাই রঙ বা নীলরঙ ধারণ করে
- শ্বাস নেওয়ার সময় নাসারন্ধ্র বেশি প্রসারিত হয়
- শ্বাস নেওয়ার সময় বক্ষপিঞ্জর এবং গলার চামড়ায় টান লাগে
- হৃদস্পন্দন খুব দ্রুত হয়
- হাঁটা, চলাফেরা করতে কষ্ট হয়

ঔষধ সেবন ঃ

- ট্যাবলেট **লিফ্লক্স** (লেভোফ্লক্সাসিন) ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ৭ দিন।
- ট্যাবলেট **এসিফ্লক্স** (স্পার ফ্লক্সাসিন) ২০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ৭ দিন।
- ট্যাবলেট **রিভারসিয়ার** (মন্টেলুকাস্ট) ১০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার করে চলবে।
- ইনহেলার **ব্রডিল এইচ এফ এ** ২ চাপ করে শ্বাসকষ্ট হলে।
- ইনহেলার **সেরক্সিন এইচ এফ এ** ২ চাপ করে দিনে ২ বার

চলবে যতদিন উপসর্গ নিরাময় না হয়। ব্যবহারের পর কুলি করতে হবে।

শিশুকে কৃমিমুক্ত রাখুন

আমাদের শিশুরা যা খায় তার এক-তৃতীয়াংশ কৃমি খেয়ে ফেলে। কৃমির আক্রমনে বাংলাদেশে শিশুরা রক্তশূণ্যতা, অ্যালার্জিসহ বিভিন্ন ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের বেড়ে ওঠা ও সুস্বাস্থ্য ব্যাহত হয়। নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, খাওয়ার আগে হাত না পরিস্কার করা ও খালি পায়ে হাটা কৃমির প্রকোপের মূল কারণ।

কিভাবে কৃমি থেকে শিশুদের মুক্ত রাখা যায়?

- শিশুদের খাওয়ার আগে ও পায়খানা ব্যবহারের পর ভালো করে সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করার অভ্যাস গড়ে তুলুন
- স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করুন
- কাঁচা ফলমূল, সালাদ বিশুদ্ধ পানিতে ধুয়ে খান
- নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি পান নিশ্চিত করুন
- জুতা ব্যবহার করুন

ঔষধ সেবন ঃ

- ট্যাবলেট **সিনটেল** (এলবেনডাজল) ৪০০ মি: গ্রাম ১টি ট্যাবলেট সেবন করতে হবে। এর ৭ দিন পর আর একটি ট্যাবলেট সেবন করতে হবে।

এর পাশাপাশি প্রতি ছয় মাস পর পর দুই থেকে ১২ বছর বয়সী সব শিশুকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে। পরিবারের সব সদস্যকেই কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করা উচিত।

ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী রোগ (সিওপিডি)

বৈশ্বয়িক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণ এবং মানুষের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অসংক্রমণ ব্যাধি। যেমন- ডায়াবেটিস, হার্টের রক্তনালির রোগ প্রভৃতি। এ রোগ দুটির সাথে এ দেশের সাধারণ মানুষ সুপরিচিত। কিন্তু ফুসফুসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রোগ, যাতে ভূগছে এ দেশের লক্ষ মানুষ, তা থেকে যাচ্ছে পর্দার অন্তরালে। ইংরেজিতে রোগটির নাম Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) যার বাংলা করলে দাঁড়ায় ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসরোধক রোগ। এটি একটি প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য রোগ। ফুসফুসের বাইরে শরীরের অন্যান্য অংশকেও (মাংসপেশি, কিডনি, হাড় প্রভৃতি) এটি আক্রান্ত করে, যা রোগের ব্যাপকতা বাড়িয়ে দিতে পারে। ফুসফুসের শ্বাসরোধক প্রক্রিয়াটি ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং তা মূলত হয়ে থাকে দূষিত শ্বাস গ্রহণের কারণে, ফুসফুসে সৃষ্ট প্রদাহের জন্য।

সিওপিডির কারন সমূহ কি?

প্রথমত :

ফুসফুসের ছোট ছোট শ্বাসনালির ভেতরের দেয়াল ক্ষতিগস্থ হয়, স্থায়ীভাবে সংকুচিত হয় এবং সেখানে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা তৈরি হয়ে বায়ুরোধক প্রক্রিয়াটি বাড়িয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত :

ফুসফুসের বায়ুকুঠুরির (Alveoli) অস্বাভাবিক প্রদাহের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে এর সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং রক্তে অক্সিজেনের প্রবাহ কমে যায়। ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল সিওপিডি স্টাডি অনুযায়ী ৪০ বছর বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব শতকরা ২১.২৪ ভাগ। সেই হিসাবে ফুসফুসের শ্বাসরোধক রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। পুরো জনগোষ্ঠির মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব শতকরা ৪.৩২ ভাগ। আমাদের দেশে বক্ষব্যাধির জন্য একমাত্র বিশেষয়িত হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউটে প্রতিদিন যে সংখ্যক রোগী ভর্তি হয়, তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসরোধ রোগে (সিওপিডি) আক্রান্ত। এটি মারাত্মক রোগগুলোর মধ্যে চতুর্থ, যা পৃথিবীব্যাপী অধিকাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও এশীয় দেশগুলোতে এ রোগে মাঝারি ও খারাপভাবে আক্রান্তের হার ৩.৫% থেকে ৬.৭% পর্যন্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্টের মতো দেশ প্রতিবছর এই রোগের পেছনে সরাসরি খরচ করে প্রায় ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পরোক্ষভাবে খরচ হয় আরো ১৪ বিলিয়ন ডলার।

রোগের কারণ:

এর প্রধান কারণ হলো- এই দেশে প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে ধূমপায়ীর সংখ্যা এবং পৃথিবীব্যাপী এটাই মূল কারণ। রোগটি যে শুধু ধূমপায়ীর নিজেরই হয় তা নয়, তারা আশপাশের নির্দোষ মানুষকেও আক্রান্ত করছে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের ফলে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী রয়েছে ঝুঁকির মুখে। বিশেষ করে আমাদের শ্রমিক জনগোষ্ঠী যারা যথেষ্ট নিরাপত্তাব্যবস্থা না নিয়ে ক্রমাগত শ্বাসের সাথে টেনে নিচ্ছে কারখানার সৃষ্ট ধূলিকণা এবং রাসায়নিক দ্রব্য পুড়ে সৃষ্ট বাষ্প।

অপরদিকে তৃতীয় বিশ্বের মহিলারাও আছেন বিপদের মধ্যে, বিশেষ করে যারা বদ্ধ ঘরে রান্নার কাজটি সারেন লাকড়ি কিংবা অন্য কোনো জৈব জ্বালানির মাধ্যমে। এছাড়া এই রোগের ক্ষেত্রে অন্য যে বিষয়গুলো বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা হলো ক্রমাগত বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, ফুসফুস এবং শ্বাসনালিতে জীবাণুর সংক্রমণ হওয়া অথবা ফুসফুস ও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলে এই রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

শ্বাসরোধক রোগের লক্ষণ কি কি?

আপনি যদি দীর্ঘদিন যাবৎ ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, আপনার কর্মক্ষেত্রে যদি বায়ুদূষণের মাত্রা বেশি থাকে, আপনার বয়স যদি ৪০ এর বেশি হয়, আপনি যদি আলো-বাতাসহীন ঘরে রান্নার কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন এবং এর সাথে যদি নিম্নলিখিত শারিরীক সমস্যাগুলো দেখা দেয়, তাহলে হয়তোবা আপনি ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসরোধক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শারিরীক লক্ষণগুলো হলো-

- শ্বাসকষ্ট, যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে, পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট আরো বেড়ে যায় এবং প্রতিদিনই অল্পস্বল্প শ্বাসকষ্ট থাকবেই
- রোগী প্রায়ই কাশিতে আক্রান্ত হয় এবং মাঝে মাঝে ক্রমাগত কফ তৈরি হতে থাকে।

আপনি যদি ঝুঁকিতে থাকা একজন ব্যক্তি হন এবং উপরিউক্ত শারিরীক লক্ষণগুলো (এক বা একাধিক) আপনার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে অবশ্যই আপনার উচিত একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে শ্বাস মাপন যন্ত্রের (স্পাইরোমিটার) মাধ্যমে শ্বাস মেপে নেয়া (যাকে বলে স্পাইরোমেট্রি) এবং এই প্রক্রিয়ায় আপনি নিশ্চিত হতে পারেন রোগটি সম্পর্কে। এই ক্ষেত্রে মহাখালীতে অবস্থিত জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতালকে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেছে নিতে পারেন। এখানে রয়েছে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা পরিমাপের পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বোত্তম ব্যবস্থা। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে অ্যাজমা সেন্টারের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত রেসপিরেটরি ল্যাব-এ।

চিকিৎসা না করার জটিলতা কি?

- শ্বাসকষ্ট এতটাই বেড়ে যেতে পারে যে সামান্য পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্টে হতে পারে। এমনকি দৈনন্দিন কাজ করার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে যেমন- বাথরুমে যাওয়া, কাপড় পরা প্রভৃতি
- ফুসফুস দেহের অক্সিজেনের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা অথবা কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে
- ফুসফুসের অক্ষমতা থেকে হার্টের কার্যক্ষমতা নষ্ট হতে পারে
- মাঝে মাঝেই শ্বাসকষ্ট প্রচন্ড রকম বেড়ে যেতে পারে এমনকি হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়
- কদাচিত ফুসফুস ফেটে গিয়ে জীবন সংহারী অবস্থার উদ্ভব হতে পারে

কোন কোন রোগের সাথে আমরা সিওপিডিকে গুলিয়ে ফেলতে পারি ?

- অ্যাজমা / হাঁপানি
- হৃৎপিন্ডের অক্ষমতা বা হার্টফেইলিউর
- ফুসফুসের যক্ষা রোগ

সিওপিডি রোগটি আমরা সবচেয়ে বেশি মিলিয়ে ফেলতে পারি অ্যাজমার সাথে। অ্যাজমা সাধারণত যে কোনো বয়সে হতে পারে। কিন্তু সিওপিডি সাধারণত ৪০ বছর বয়সের পর হয়ে থাকে। অ্যাজমার রোগীরা সাধারণত আক্রান্ত সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে সম্পূর্ণ ভালো থাকে। কিন্তু এই রোগের রোগীরা সব সময় কিছু না কিছু শ্বাসকষ্টে ভুগে থাকেন। সিওপিডি রোগীর ইতিহাস নিলে বোঝা যায়, তাদের প্রায় সবাই ধূমপান করেন অথবা কোনো না কোনোভাবে তারা বায়ুদূষনের শিকার। অপরদিকে অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এলার্জির ইতিহাস। এছাড়া শ্বাস মাপন যন্ত্রের মাধ্যমে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন।

রোগটি কি প্রতিরোধযোগ্য ?

অবশ্যই ! পূর্বে রোগটির পরিচিতির মধ্যে এ কথা বলা হয়েছে। আমরা সমন্বিতভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নিতে পারি-

- ধূমপান ছাড়তে হবে
- পরিবেশ দূষণ কমিয়ে আনতে হবে, পরিবেশ দূষণকারী কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে
- রান্নাঘরে আলো বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকতে হবে

ঔষধ সেবন ঃ

- ট্যাবলেট **লিফ্লক্স** (লেভোফ্লক্সাসিন) ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ৭ দিন।
- ট্যাবলেট **ওডাজিথ** (এজিথ্রোমাইসিন) ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার ৫ দিন।
- ইনহেলার **ব্রডিল এইচ এফ এ** ২ চাপ করে শ্বাসকষ্ট বা কাশি হলে।
- ইনহেলার **সেরক্সিন এইচ এফ এ** ২ চাপ করে দিনে ২ বার যত দিন উপসর্গ নিরাময় না হয়। ব্যবহারের পর কুলি করতে হবে।

কলেস্টেরল- কিছু তথ্য

কলেস্টেরল হল এক ধরনের পিচ্ছিল চর্বি জাতীয় জিনিস যা নতুন কোষ তৈরি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। যদি কেউ উচ্চ-কলেস্টেরল- যুক্ত খাবার বা বেশি মাত্রায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট- যুক্ত খাবার খায়, কিংবা তার শরীরের ধারা এমন যে, দেহ বেশি কলেস্টেরল তৈরি করে, তাহলে তার শরীরে কলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকবে। কলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকলে ধমনী বা রক্তবাহী নালীগুলি (arteries) শক্ত হয়ে যায়। এটি ঘটে যখন চর্বি (কলেস্টেরল) এবং ক্যালসিয়াম ধমনীর ভেতরে জমতে শুরু করে। জমতে জমতে এরা ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি শুরু করে- অন্তিম ক্ষেত্রে চলাচল রুদ্ধ করে দেয়। এর ফলে করোনারি আর্টারি রোগে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। দেহে কলেস্টেরল আসে দুটি জায়গা থেকে : আমাদের খাবার থেকে আর দেহের যকৃত (Liver) যা সৃষ্টি করে তার থেকে। দেহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় আশিভাগ কলেস্টেরল যকৃতই সৃষ্টি করতে পারে ।

কলেস্টেরল বেশি কথাটার অর্থ কি ?

রক্ত পরীক্ষা করে কলেস্টেরলের পরিমান মাপা যায়। সেখানে থেকে বোঝা যায় কলেস্টেরলের পরিমান মাত্রাতিরিক্ত কিনা। কলেস্টেরল মাপা হয় প্রতি ডেসিলিটারে কত মিলি গ্রাম আছে এই হিসেবে (mg/dL)। অনেক সময় প্রতি লিটারে কত মিলিমোল আছে (mmol/L) সেই হিসেবেও মাপা হয়।

কলেস্টেরলের পরিমান		শ্রেণী বিভাগ
(mg/dL) হিসেবে	(mmol/L) হিসেবে	
২০০ বা তার কম	৫.১৭ বা তার কম	ভালো
২০০ - ২৩৯	৫.১৭- ৬.১৮	বেশির দিকে
২৪০- তারও বেশি	৬.২১- তারও বেশি	বেশি

এলডিএল (LDL) এবং এইচডিএল (HDL) কলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড কি ?

কলেস্টেরল রক্তের মধ্যে বাহিত হয় প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়। এই সংযুক্ত কলেস্টেরল- প্রোটিনকে বলা হয় লিপোপ্রোটিন। লিপোপ্রোটিনকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। বেশি ঘনত্বের (High density), কম ঘনত্বের (Low density), বা খুব কম ঘনত্বের (Very low density)। লিপোপ্রোটিন কোন শ্রেণীতে পড়বে তা নির্ভর করে প্রোটিনের তুলনায় চর্বির পরিমান কতটা। যদি প্রোটিনের তুলনায় চর্বি বেশি থাকে তাহলে তাকে Low density lipoprotein (LDL) কলেস্টেরল বলা হয়। LDL হল "খারাপ" কলেস্টেরল, কারণ এটি রক্তবাহী ধমনীর দেয়ালে জমে নালীপথ রুদ্ধ করে দিতে পারে। LDL এর পরিমান কমাতে পারলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদির সম্ভাবনা কামানো যায়।

"খারাপ" LDL কলেস্টেরলের পরিমান		শ্রেণী বিভাগ
(mg/dL) হিসেবে	(mmol/L) হিসেবে	
১০০ বা তার কম	২.৬ বা তার কম	ভালো
১০০ - ১২৯	২.৬ -৩.৩৫	মোটামুটি
১৩০-১৮৯	৩.৩৫-৪.১০	বেশির দিকে
১৬০-১৮৯	৪.১২-৪.৮৮	বেশি
১৯০ তারও বেশি	৪.৯০ বা তারও বেশি	খুবই বেশি

High density lipoprotein cholesterol (HDL) কে অনেক সময় বলা হয় "ভালো" কলেস্টেরল, কারণ এটি রক্তবাহী নালীতে কলেস্টেরল না জমতে সাহায্য করে। এতে ফ্যাটের তুলনায় প্রোটিন বেশি থাকে। HDL কলেস্টেরল পরিমান বেশি থাকলে হার্টের রোগী বা যাদের হার্টের অসুখের সম্ভবনা আছে তাদের পক্ষে ভালো।

"ভালো" LDL কলেস্টেরলের পরিমান		শ্রেণী বিভাগ
(mg/dL) হিসেবে	(mmol/L) হিসেবে	
৬০ বা তার কম	১.৫৬ বা তার কম	বেশি
৪০ বা কম	১.০৪ বা কম	কম

ট্রাইগ্লিসারাইড হল আরেক ধরনের চর্বি জাতীয় পদার্থ যেটি খুব কম ঘনত্বের লিপোপ্রোটিনের মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। রক্তে খুব অল্প পরিমানেই ট্রাইগ্লিসারাইডস থাকে, বেশির ভাগেই জমা থাকে টিস্যুর মধ্যে। LDL যখন বেশি আছে, তখন ট্রাইগ্লিসারাইডসও বেশি থাকলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ট্রাইগ্লিসারাইড mg/dL	ট্রাইগ্লিসারাইড mmol/L	শ্রেণী বিভাগ
১৫০-১৯৯	৩.৮৮-৫.১৪	বেশির দিকে
২০০ বা তার বেশি	৫.১৭ বা তার বেশি	বেশি
৫০০ বা তার বেশি	১২.৯২ বা তার বেশি	খুব বেশি

ঔষধ সেবন ঃ

- ট্যাবলেট **এটাসিন** (এটেরোভাস্টেটিন) ১০ মি: গ্রা: দিনে ২ বার অথবা ২০ মি: গ্রা: দিনে ১ বার।
- ট্যাবলেট **টেনোরেন** (এটিনোলোল) ৫০ মি: গ্রা: দিনে ২ বার অথবা ১০০ মি: গ্রা: দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **টেনোক্যাপ** (এটিনোলোল + এমলোডিপিন) ২৫/৫ মি: গ্রা: দিনে ১ বার অথবা ৫০/৫ মি: গ্রা: দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **এবেটিস** (অলমেসারটান) ২০ মি: গ্রা: দিনে ২ বার অথবা ৪০ মি: গ্রা: দিনে ১ বার। অথবা
- ট্যাবলেট **রোসাটান** (লোসারটান) ২৫ মি: গ্রা: দিনে ২ বার অথবা ৫০ মি: গ্রা: দিনে ১ বার।

ইনফো কুইজ

ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপলাই কার্ডের ইনফো কুইজ অংশে সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন এবং এটি ১৫ মে ২০১২ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করুন।

১। নিচের কোন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমনের ফলে পেপটিক আলসার হয় ?

ক) ট্রিপনেমা প্যালিডাম
খ) হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি
গ) হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা
ঘ) স্ট্রেপটোকক্কাস অরিস

২। অ্যাজমা হলে ফুসফুসের শ্বাসনালী গুলোর দেয়াল-

ক) চিকন হয়ে যায়
খ) নষ্ট হয়ে যায়
গ) মোটা হয়ে যায়।
ঘ) কোনটিই নয়।

৩। নিচের কোন ধরনের খাবারের কারণে উচ্চ রক্ত চাপ হয় ?

ক) ভিটামিন যুক্ত খাবার
খ) আঁশ যুক্ত খাবার
গ) কলেস্টেরল যুক্ত খাবার
ঘ) শর্করা যুক্ত খাবার

৪। ফুসফুসের গুরুত্ব পূর্ণ রোগ নয় নিচের কোনটি ?

ক) ব্রঙ্কাইটিস
খ) অ্যাজমা
গ) হাইপার টেনশন
ঘ) সি ও পি ডি

৫। কলেস্টেরল হলো একধরনের চর্বি জাতীয় জিনিস যা-

ক) নতুন কোষ নষ্ট করে
খ) নতুন কোষ তৈরী করে
গ) নতুন কোষ সংক্রমন করে
ঘ) কোনটিই নয়

৬। নিচের কোন খাবার বা পানীয় বুকে জ্বালা হওয়ার সম্ভবনা বাড়ায় ?

ক) লেবু জাতীয় ফলের রস
খ) ক্যাফেইন যুক্ত পানীয়
গ) ভাজা পোড়া খাবার
ঘ) উপরের সবগুলি

৭। সি ও পি ডি হলে ফুসফুসের কি হয় ?

ক) ফুসফুসের ছোট ছোট শ্বাসনালীর ভিতরের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্থ হয়
খ) ফুসফুসের বায়ুকুঠুরী ক্ষতিগ্রস্থ হয়
গ) উপরের সবগুলি
ঘ) উপরের কোনটিই নয়

৮। আমাদের শিশুরা যা খায় তার কত অংশ কৃমি খেয়ে ফেলে ?

ক) দুই তৃতীয়াংশ
খ) তিন পঞ্চমাংশ
গ) চার তৃতীয়াংশ
ঘ) এক তৃতীয়াংশ

এসিআই লিমিটেড